Journal of Cultural Research Studies, Vol-III Issue-2(2024), p01-07. (ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Open Access Journal

‘অরণ্যের অধিকার’: বিরসা ও মুণ্ডারি সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবনালেখ্য

রবীন্দ্রনাথ হাঁসদা, সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

Abstract:

In this research article, the stories behind the sufferings and struggles of the people belonging to the Mundari community have been discussed. Many years ago, their civilization was built around the forested Chotanagpur plateau. The purpose is to avoid the influence of urban civilization and build a settlement in a quiet and secluded place far away in the middle of nature. But they could not stay calm for long. As soon as the company rule was established, the need for wood in the pursuit of development fell upon these forest areas. And that's when the tribal people fought against the royal power. They do not want any harm to the good of the country. They say nothing unless it harms them. But no one can accept it silently when the rule-exploiting tyranny is carried out day after day. He did not hesitate to choose the method of fighting by being forced to risk his life in order to regain the rights of the forest. The history of that struggle becomes the subject of this article. In this narrative, we get a picture of the plight and lamentation of the Aranyachari tribal people. The primitive inhabitants of eastern India joined the movement on that day to protect their forest motherland from the coral claws of external enemies. People like Birsa Munda are the main and last masters of this movement. Therefore, forest rights have become the lifeblood of Birsa and its community.

Key Words: Indigenous peoples, forest laws, forest rights, right to education, land rights and land problems, exploitation, repression.

প্রাক্-কথন: ভারতবর্ষের ‘আদিম যে বাসিন্দা’ সুপ্রাচীন কাল থেকে এ দেশে বসবাস করে আসছে তারাই ‘আদিবাসী’ বলে পরিচিত। ইংরেজী Tribe (ট্রাইব) শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় বর্তমানে ‘আদিবাসী’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আদিম অধিবাসীদের জীবনযাপনের চিত্র গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, আদিবাসী সমাজের মূল ধারাটির পতাকা যারা বহন করে নিয়ে চলেছে তারা ‘মুণ্ডা’ বলে পরিচিত।

> সভ্য মানুষের পায়ে চলা পথ যেখানে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সেখান থেকে হয়েছে ওদের পথের প্রারম্ভ। নীল আকাশের বুকে অস্পষ্ট ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত দেখা যায় গগনচুম্বী পর্বতসীমা, একটা নয় -- একটার পর একটা। ওদের নাম কেউ জানে না, নিজেদের দেওয়া পরিচয়েই ওরা মহান হয়ে উঠেছে।[1]

এদেশে ইংরেজ শাসনের আগে আদিবাসী সমাজ তাদের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বর্তমান ছিল। তাদের বিশাল রাজত্ব ছিল বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলে। বহু কাল ধরে ছোটনাগপুরের জঙ্গল বেষ্টিত আদিবাসী গ্রামগুলিতে শান্তিপূর্নভাবে

Journal of Cultural Research Studies, Vol-III Issue-2(2024), p01-07. (ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Open Access Journal

বসবাস করে এসেছে। অরণ্য প্রকৃতি তাদের সমাজ জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ছিল। অরণ্যপ্রকৃতির সঙ্গে এই নিবিড় সম্পর্কে বিচ্ছিন্নতা ডেকে আনে ১৮৭৮ এর অরণ্য আইন (Indian Forest Act, 1878)। আদিবাসীদের বঞ্চনার কথা প্রসঙ্গে ১৮৭৮ এর অরণ্য আইন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ১৮৭৮ CE তে ব্রিটিশ রাজ সাম্রাজ্যবাদের সুবিধার্থে ভারতের সমস্ত অরণ্য নিজেদের আওতায় নিয়ে নেয়। এই আইন অনুযায়ী অরণ্যের সমস্ত কাঁচা মাল ও রসদের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে ওঠেন ব্রিটিশ রাজ। অন্য সবাই, তাদের অনুমতি ছাড়া বা তাদের কর না দিয়ে, অরণ্য ব্যবহারের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হন।

> ক্রমশঃ বনরাজ্য যা তারা ভোগ করত বিনা রাজস্বে, তাই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, এমনকি বনের ফল ফসল পর্যন্ত ! ..বনের লাক্ষা আর বিনা পয়সায় কাটা চলবে না। বনকে যেন ডাক করে নিয়েছে! [2]

এটি মূলত করা হয়, ইংল্যান্ডের postindustrial revolutionized market expansion এর জন্য এবং রেল লাইনের স্লিপার, জ্বালানি ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় এক্সট্রা কাঠের জোগান দেওয়ার জন্য। একারণে অরণ্যকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয় ও তার ফলস্বরূপ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন আদিবাসীরা। যে অরণ্যকে ঘিরে তাদের রোজগার, health and medicinal system, সেগুলি সব কেড়ে নেওয়া হয়। এমনকি তারা নিজেদের বাসস্থানও হারালেন এই আইন অনুযায়ী। ফরেস্ট কমিউনিটি ও তার সাথে জড়িয়ে থাকা ভারতের প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট ও বিপর্যস্ত হয়। এটিকে ecological watershed বলা হয়েছে।[3] (Gadgil & Guha, 1992)

কথন: আধিপত্য বিস্তারের লড়াই মূলত অধিকার কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। তাই অধিকার নিয়ে লড়াই যুগ যুগান্তর কাল ধরে হয়ে এসেছে। আজও অব্যাহত রয়েছে। অরণ্যের অধিকার আসলে কার -- মানবের না দানবের! দানব অর্থে অগাধ পুঁজির অধিকারীরা। কালো টাকার মালিকেরা। নামে বেনামে প্রচুর ধন সম্পদের অধিকারী ধন কুবেরেরা। দানবের তো কখনোই হতে পারে না কারণ দানবের সঙ্গে অরণ্যের কোন কালেই যোগ ছিল না। এরা শুধু রাবণের মত হরণ করতে, লুঠপাট করতেই জানে। প্রকৃতিকে ভাল বাসতে জানে না। প্রকৃতির কোলে লালিত-পালিত আদিবাসী মানুষদের দুঃখ-যন্ত্রণার কথাও ভাবে না। ছলে বলে কৌশলে সর্বস্ব কেড়ে নিতে জানে। তাই অরণ্যের অধিকার জোর করে ছিনিয়ে নিতে দ্বিধা করে নি। এ অধিকার জন্মগত ও উত্তরাধিকার সূত্রে যদি কেউ পেয়ে থাকে তাহলে তা আদিবাসীদেরই প্রাপ্য। এর সমর্থনে মহাশ্বেতা দেবীর বক্তব্যের সাথে সহমত পোষণ করে নিয়ে বলতে হয় ---

> অরণ্যের অধিকার কৃষ্ণ ভারতের আদি অধিকার। যখন সাদা মানুষের দেশ সমুদ্রের অতলে ঘুমোচ্ছিল তখন থেকেই কৃষ্ণ ভারতের কালো মানুষেরা জঙ্গলকে মা বলে জানে। [4]

তারা অরণ্য প্রকৃতিকে নিজেদের জীবন জীবিকার কাজে লাগিয়েছে। অরণ্যের ছত্রছায়ায় থেকে লালিত-পালিত হয়েছে। তাই অরণ্যের অধিকার আদিবাসীদের হক বলা যায়। এই আখ্যানে এই রকমই এক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই দেখি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মহাজন-জমিদার-জোতদারের সাহায্যে আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। ফলে জমির উপর সমস্ত অধিকার হারিয়ে ফেলে মুণ্ডারা। কেড়ে নেওয়া হয় অরণ্যের

অধিকার। তারা হারানো অধিকার ফিরে পাবার জন্য সেদিন গণ-সংগ্রাম গড়ে তোলে বিরসার নেতৃত্বে। বিরসা আর তার প্রচারক জনগণের দুঃখদৈন্যকে মূলধন করে তাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তিকে গড়ে তুলেছিল।

এদেশে আদিবাসী মানুষদের শিক্ষার অধিকার ছিল না বললেই চলে। কোনক্রমে মিশনারীদের হাত ধরে আদিবাসী মানুষেরা প্রথম শিক্ষার মুখ দেখে। শিক্ষাক্ষেত্রে পাওয়া এই সামান্য সুযোগটুকু কাজে লাগিয়ে তারা নিজেদের মার্জিত করে তুলতে চায়। কিন্তু বাধ সাধে কিছু দেশীয় পণ্ডিত মানুষেরা যারা এটাকে একদম ভালো ভাবে মেনে নিতে পারে না। এইসব স্বার্থান্বেষী শিক্ষকদের দুর্ব্যবহারের কারণে আদিবাসী শিশু শিক্ষার্থীরা শিক্ষার সুযোগকে কাজে লাগাতে পারেনি। তারা স্কুল ছুট হয়ে গিয়ে বিপথে চালিত হয়েছে, যা আজও অব্যাহত রয়েছে। এই আখ্যানে দেখি বিরসা স্কুল পালিয়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসে। যে সমাজ নাচ গান, খেলা মেলা আর মাঝে মধ্যে লড়াই-সংগ্রাম ছাড়া কিছু বোঝে না তাদের দলে গিয়ে নাম লেখাতে বাধ্য হয়। সব স্বপ্ন এক নিমিষে হারিয়ে যায়। শিক্ষার সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি সমাজের মানুষের যোগ্য নেতৃস্থানীয় হয়ে ওঠা যায়। সেই সুযোগ আদিবাসী মানুষেরা যুগ-যুগান্তর কাল ধরে হেলায় হারিয়েছে। যার পরিণতিতে জন্মসূত্রে ক্রিমিন্যাল তকমা গায়ে সেঁটে যায়। উপরন্তু দারিদ্র তো কিছুতেই কাটতে চাই না। দারিদ্রের কারণে ভাতের বদলে ঘাটো খেয়ে পেট ভরাতে হয়। তাই সেদিনে ভাতের জন্যও তারা লড়াইয়ে সামিল হয়েছিল।

> ভগবান মুণ্ডারা দিকুদের মত ভাত খাবে বলে লড়েছিল। যত কারণে লড়েছিল, তাতে ওটাও একটা কারণ।[5]

দারিদ্র দূরীকরণের নিমিত্তে এদের আন্দোলনে সামিল করানো হয় বটে তবে লাভ খুব বিশেষ হয় না। তারা যেই তিমিরে ছিল সেখানেই পড়ে রয়। এই আখ্যান সূত্রেই জানা যায়, মুণ্ডারি ছেলে আট বছর বয়স হলেই নিজের পেটের ‘ঘাটো’ যোগাড় করার ক্ষমতা অর্জন করে। দারিদ্র্যের কারণে এরা লেখাপড়া করার ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ দেখায় না। আর এদের সমাজের অভিভাবকেরাও এটা মেনে নিতে পারে না। সেটা বিরসার মেসোর ব্যবহার দেখেই আমাদের বুঝে নিতে হয়। তিনি শিক্ষার ঘোরতর বিরোধি বলেই একথা বলতে পেরেছেন –

> মুণ্ডা যখন লিখাপড়ি করে দিকু হতে যায় তখন মরে। মুণ্ডা হয়ে জন্মাব, আবার লিখিপড়ি করব, উ চালকাড়ের চাল।[6]

এই রকম মানসিকতা যে সমাজ কর্তারা দেখিয়ে থাকে সেই সমাজের আর যাইহোক ভাল হতে পারে না।

তবু ঘটনাচক্রে দাদা কোমতার নির্দেশে বিরসা বুরজুর জার্মানি মিশনে ভর্তি হয়। এইভাবে শেষ অবধি বিরসার নতুন জীবন সূচিত হয়ে যায়। এখানেই সে লোয়ার প্রাইমারী শিক্ষা সমাপ্ত করে। এরপর উচ্চশিক্ষার জন্য যেতে হয় চাইবাসা মিশনে। এখানে এসে অমূল্যর সঙ্গে পরিচয় হয়। অমূল্যকে সে ভবিষ্যৎ কর্ম পদ্ধতির কথা ব্যক্ত করে জানায়—

> লেখাপড়া শিখবে, অনে-ক লেখাপড়া, তা বাদে কাছারি করে বাবার খুটকাট্টি গ্রামের জমি ফিরাবে।[7]

Journal of Cultural Research Studies, Vol-III Issue-2(2024), p01-07. (ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Open Access Journal

কিন্তু বিরসার জীবনে সে সাধ পূরণ হয়নি। ছোটনাগপুরের টেনিওর আইনে বলা আছে যার জমি সে রাখতে পারবে। মুণ্ডারা ১৮৭৮ সালে সরকারকে জানিয়েছিল যে ছোটনাগপুর তাদের মালিকানা দেশ, সে দেশে তাদের অধিকার কায়েম করা হোক। কিন্তু তাদের আর্জি মানা হয়নি। ফলে ১৮৮৭-৮৮ সালে সর্দারদের সঙ্গে মিশনের বাক-বিতণ্ডা দেখা দেয়। ফাদার নট্রট সর্দারদের 'জোচ্চোর', 'ঠগ' বলে প্রতিপন্ন করলে বিরসার রক্তে আগুন লেগে যায়। সর্দারদের অপমানে বিরসা গর্জে ওঠে, প্রতিবাদ করে ফাদারকে বলে--

> আপনারা সর্দারদের জোচ্চোরি বলছেন কেন?... কী জোচ্চোরি করেছে সর্দাররা? তারা মুণ্ডাদের হকের জন্যে লড়ছে, কয়েদ হয়াছে, জান দিয়াছে, জোচ্চোর তারা?[8]

এরপর ফাদার যখন সকল মুণ্ডাদের 'বেইমান' বলে অপমান করে তখন বিরসার মিশনের প্রতি যে বিশ্বাস, ফাদারের প্রতি যে ভালোবাসা ছিল তা নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে যায়। বিরসা তখন 'সাহেব সাহেব এক টোপি। সরকার যা, মিশন তা, সব এক সমান' এই কথা বলে মিশনের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করে বাড়িতে চলে আসে।

ভূমি সমস্যা: একটি চিরন্তন সমস্যা। যে সমস্যার হাত হতে আজও আদিবাসীরা মুক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে আদিবাসীরাই ভারতবর্ষের ভূমিপুত্র। দীর্ঘদিন ধরে তারা গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে নিজেদের জমিতে চাষ-আবাদ করে এসেছে, আজও করে চলেছে। মুণ্ডা জাতির জমির এই যৌথ মালিকানাভিত্তিক চাষ প্রথার নাম ছিল 'খুটখাট্টি'। ভারতে কোম্পানি শাসন শুরু করলে তাদের চিরাচরিত 'খুটখাট্টি' প্রথা বাতিল করা হয়। ফলে তাদের বসবাস অঞ্চলটি জায়গিরদার, ঠিকাদার, বণিক ও মহাজন শ্রেণির দখলে চলে যায়। জোর করে তাদের উচ্ছেদ করা হয়। যেমনটি পূর্তি মুণ্ডার ক্ষেত্রে দেখি।

> ওর পূর্বপুরুষ পূর্তি মুণ্ডা যেখানেই যেত, সেখানেই নাকি মাটি থেকে হয় অভ্র বেরুত, নয়তো কয়লা। বউ ছেলে মেয়েকে চাইবাসা থেকে পালামৌ জেলায় আনলো পূর্তি। .... বন কেটে বসত বাঁধল। এবার ওর খেতের মাটির নীচ থেকে বেরুল পাথরে তৈরি হাতিয়ার। সঙ্গে সঙ্গে তা নিয়ে কথা হল এবং হঠাৎ একদিন সায়েব-বাঙালি-বিহারী ---- নানা রকম লোকজন হাজির হয়ে ওকে তুলে দিল বসত থেকে।[9]

ব্রিটিশের নতুন ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার দরুণ মুণ্ডাদের উপর ভূমি-রাজস্ব অধিক হারে চাপানো হয়। তাদের জমিগুলি যৌথ মালিকানার বদলে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। জমির দখল হারিয়ে নিজেদের বাসভূমিতেই জমিদারের অধীন প্রজা হিসেবে বেঁচে থাকতে হল। জমিদাররা বিনা মজুরিতে 'বেঠবেগারি' খাটাত। আদিকাল থেকে যে জমিকে জীবনের সর্বস্ব বলে স্বীকার করে এসেছে, যে জমিগুলি তাদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করত, সেই জমি থেকে যখন উচ্ছেদ হতে হল। তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে গিয়ে রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে জমি ফিরে পাওয়ার আন্দোলন গড়ে তুলেছে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার কথা বলতে গেলেই শাসন-শোষণ, দমন-পীড়নের কথা বলতে হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতার কথা উল্লেখ করতে হয়। যার কারণে আজও এদের মধ্যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ শেষ হয়েও হইল না শেষের মত অবস্থা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সব খারাপ কিছুর দায়ভার আদিবাসী মানুষদের উপর চাপিয়ে

প্রভাবশালী মানুষেরা পিঠ বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করতে গিয়ে বিপত্তি নামিয়ে নিয়ে আসে। সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাওয়া থেকে দিনের পর দিন বঞ্চনা করাটাও এরা মুখ বুজে মেনে নিতে পারে না। আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেভাবে এদের সব সম্পত্তি ভোগদখলের অধিকার থেকে যুগ-যুগান্তর কাল ধরে বঞ্চনা করা হয়েছে তা মেনে নেওয়া যায় না। আজও বেনিয়া শ্রেণী পসার সাজিয়ে ব্যবসায়ী নিয়ম-নীতিকে বিশেষ করে এই আদিবাসী মানুষদের শোষণ-শাসনের কাজে বেশি করে লঙ্ঘন করে থাকে। এই সব মানুষ কোন খাদ্যদ্রব্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, বিনোদন সামগ্রী কিনতে এলে পরে মূল্য মুহূর্তের মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে যায়। আর এরা কোন দ্রব্য সে দুধ, ডিম, শিকার করে নিয়ে আসা মাংস, মাছ নিয়ে এলে দাম দেওয়া হয় না। যতটা সম্ভব কম মূল্যে কিনে নিয়ে চড়া মূল্যে বিক্রয় করা হয়। যেমন --

> প্রথম সিধু এ দরে জিনিস দেয়নি ভকতকে। কিন্তু সকলেই বলেছিল সেই এক দর। তার ওপর দিতে গিয়েও তার বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না। তার এক কেঁড়ে ঘি এক সেরের বেশি নয়। তার আন্দাজ ছিল, অন্তত আড়াই সের ঘি।[10]

এ থেকেই শোষণের চিত্র পরিষ্কার হয়ে যায়। আর দাম দরে খুশি না হলে পরে শাসন করতেও বণিক শ্রেণী দ্বিধা করে না। এসব অনৈতিক ক্রিয়া-কর্মের কথা জেনে বুঝেও প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা যদি এসব অসাধু ব্যবসায়ীদের শাস্তি দিত তবে আদিবাসী মানুষদের আইন হাতে তুলে নিতে হত না। আর তখনই প্রশাসন নড়ে চড়ে বসে। গেল গেল রব তুলে যারা প্রকৃত দোষী যাদের কারণে এই গন্ডগোল তাদের আড়াল করতে নিরীহ-শান্তিপ্রিয় আদিবাসীদের ধরে শাস্তি দিয়ে সব কিছু ধামাচাপা দিতে প্রশাসন উঠে পড়ে লাগে। এর হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য আদিবাসী মানুষেরা বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে থাকে। কিন্তু তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয় আদিবাসী মানুষদের। তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়। রাত বিরেতে পুলিশ হানা দেয় গৃহস্ত ঘরে। পালিয়ে বেড়াতে হয়। পুরুষশূন্য হয়ে পড়ে গ্রামগুলি। ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। তাদের সব সম্পত্তি করায়ত্ত করে বাজেয়াপ্ত করা হয়। নিলামে তোলা হয় ভিটে-মাটি।

রাজনৈতিকভাবে অরণ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এই আদিবাসী মানুষেরা একদম ভালভাবে মেনে নিতে পারে নি। তারা প্রকৃতির বরপুত্র। অরণ্য রক্ষণাবেক্ষণের পুরো দায়িত্ব তারা অজান্তেই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। তারা ভূমিপুত্র, ভূমির সাথে, এ দেশের জল-হাওয়া-মাটির সাথে তাদের নিবিড় যোগ রয়েছে আদিমকাল থেকে। তাই তারা জন্মসূত্রেই অরণ্যের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে উঠেছে। কবি কল্পনায় ধাত্রী মাতৃরূপী, অরণ্য রানী দেবীর প্রতিমূর্তি। এই বিশ্বাসে এরা আগাগোড়াই বিশ্বাস করে এসেছে। শান্ত-শিষ্ট-সহজ-সরল মানুষদের বিশ্বাস নিয়ে এক রকম ছিনিমিনি খেলা হয় সেদিন। স্বাভাবিকভাবে সেদিন আদিবাসীরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে, এই অবিচারের বিরুদ্ধে, রাজশক্তির সঙ্ঘবদ্ধ অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভয়ে ভীত না হয়ে মুষ্টিমেয় কিছু আদিবাসী মানুষ বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিল। তারা পরিণতির কথা ভেবে পিছিয়ে আসেনি। অশান্তির ভয়, জুলুমবাজির ভয়কে জয় করে সেদিন তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। বীরসা মুন্ডার নেতৃত্বে আদিবাসীরা বিদ্রোহ সংগঠিত করেছিল। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ভয় না পেয়ে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে জন

সংযোগ গড়ে তুলেছে। জন সাধারণকে পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তুলে অরণ্য বাঁচানোর অভিযানে সামিল করে তুলতে পেরেছিল।

সেদিন রাজদ্রোহিতার অভিযোগে তাদের কারাবাসের সাথে সাথে তাদের ভিটে মাটি কেড়ে নিয়ে নিলাম করা হয়েছে। যা চরম অমানবিক বললেও কম বলা হয়। তাই দেশ-দশের ভাল করতে গিয়ে তারা দেশবাসীর কাছে খারাপ হয়ে যায়। চক্রান্ত করে বলির বখরা করা হয়। পরাধীন দেশেও সুবিধাবাদীরা একচেটিয়া সুযোগ-সুবিধা নিয়েছে। আবার স্বাধীন দেশেও তারা সুবিধা নিয়ে চলেছে। অথচ তাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ সেদিন চাইনি দেশ স্বাধীন হোক। যদি চাইত একযোগে স্বাধীনতার আন্দোলনে সামিল হয়ে বিদেশী শাসকদের দেশ থেকে তাড়িয়ে ছাড়ত। আর দুশো বছরের পরাধীনতার গ্লানি বয়ে বেড়াতে হত না। অথচ ভারত বিধাতার কী নিষ্ঠুর পরিহাস যে, দেশ স্বাধীন হতেই তারা আবার হামলে পরে ক্ষমতা দখল করে পদ নিয়ে দন্ডমুন্ডের কর্তা সেজে আদিবাসীদের বঞ্চনা করে চলেছে। যা ভাবা যায় না। যুগে যুগে কালে কালে আদিবাসীরা এই দেশে শুধু বঞ্চিতই রয়ে গেল।

উপসংহারে, এসে একথায় বলতে হয় এ দেশের আদিবাসী মানুষেরা শিক্ষার অধিকার, কর্মের অধিকার, সামাজিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে জীবনযাপন করে চলেছে। তবু তারা সেদিন অরণ্য বাঁচাও আন্দোলনে একডাকে সামিল হয়েছিল। সত্যিই তো অরণ্য বাঁচলে পরে সারা জীবজগৎ বাঁচবে। শুধু আদিবাসীরা তো বাঁচবে না। তাহলে সবার স্বার্থে লড়াই করেছিল যারা তারা সবার কাছে ভাল তো হয়ই নি। বরং রাজশক্তির পাশাপাশি সুবিধাবাদী মানুষেরাও তাদের বিরুদ্ধচারণ করতে দ্বিধা করেনি। সত্যিই তো আজকের দিনে যখন পরিবেশবিদরা পরিবেশ বাঁচানোর ডাক দিয়ে র‍্যালি করে থাকে তখন সবাই দুহাত তুলে তাদের বাহবা জানায়। তাহলে প্রথম পরিবেশ বাঁচানোর লড়াই যারা করেছিল তাদের শুধুই পুরস্কারস্বরূপ একতরফা অবহেলা আর লাঞ্ছনা জুটেছিল। তাই তো এই দেশে আন্দোলনের অবসান আর হয় না। উত্তরকালে তেভাগা আন্দোলন থেকে শুরু করে খাদ্য আন্দোলন হয়ে নকশালবাড়ি আন্দোলন আর বর্তমান সময়ে মাওবাদী আন্দোলন তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ।

তথ্যসূত্র:

1. রাজগুরু, শ। (১৯৫)। *শালপিয়ালের বন* (পৃ. ১), কলকাতা: অভ্যুদয় প্রকাশনী।

2. রাজগুরু শ। (১৯৫)। *শালপিয়ালের বন* (পৃ. ৪), কলকাতা: অভ্যুদয় প্রকাশনী।

3. Gadgil, M., & Guha, R. (1992). *This Fissured Land: An Ecological History of India*. New Delhi: Oxford University Press.

4. দেবী, ম। (১৯৭৬)। *অরণ্যের অধিকার* (পৃ. ৭০), কলকাতা: করুণা।

5. দেবী, ম। (১৯৮০)। *চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর* (পৃ. ১৭), কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

Journal of Cultural Research Studies, Vol-III Issue-2(2024), p01-07. (ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Open Access Journal

6. দেবী, ম। (১৯৭৬)। *অরণ্যের অধিকার* (পৃ. ৪৮), কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

7. দেবী, ম। (১৯৭৬)। *অরণ্যের অধিকার* (পৃ. ৫৯), কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

8. দেবী, ম। (১৯৭৬)। *অরণ্যের অধিকার* (পৃ. ৬৫), কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

9. দেবী, ম। (১৯৮০)। *চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর* (পৃ. ১), কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

10. বন্দ্যোপাধ্যায়, ত। (১৯৬৬)। *অরণ্যবহ্নি, তারাশঙ্কর রচনাবলী* (পৃ. ৩৫৩), কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।